অর্ধেক শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারেনি

অভিমত

এম. আরজু

ছাত্রছাত্রীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বলা যায় এসএসসি। মূলত এখান থেকেই শুরু হয় একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবন। এবার এসএসসি পরীক্ষায় অর্ধেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারেনি। গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় ১০ লাখ ২৪ হাজার ৫৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে পাস করেছিল ৫ লাখ ৯৭ হাজার ৯৯৫ জন এবং ফেল করেছিল ৪ লাখ ২৬ হাজার ৫৮৭ জন। এর সঙ্গে বোর্ডের ডাটা প্রসেসিংয়ে ত্রুটির কারণে ফল বিভ্রাটের শিকার হয়েছিল ৯৫ হাজার ৪৬৮ জন। আবার ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন শিক্ষার্থী পাস করেনি যা নিঃসন্দেহে কোন সুখবর ছিল না। অবশ্য দায় এড়াতে তখন শিক্ষা সচিব সংবাদ সম্মেলন করে এই ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষক আন্দোলনকে। একজনও পাস করেনি —এমন ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন ভাতা বন্ধের ঘোষণাও শুনেছিলাম। কতটুকু কার্যকর হয়েছে তা জানি না। তবে যে শিক্ষায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ফেল করে সেই 'সিস্টেমসস্' শিক্ষার পেছনে সময় ও অর্থ ব্যয় করা কতটুকু যৌক্তিক তা ভেবে দেখা দরকার। যারা ফেল করে তারা বছরের পর বছর কিভাবে ওপরের ক্লাসে উঠে এবং দশ বছর পড়ালেখা করেও এসএসসি পাস করার মতো যোগ্যতা কেন অর্জন করতে পারে না তা খতিয়ে দেখা দরকার। এবার শিক্ষক আন্দোলন নেই। ফলাফল বিপর্যয় হলে তার দায়ভার কে নেবে? শিক্ষার্থীরা অংক, ইংরেজীতেই বেশি ফেল করে। ফেল করা প্রসঙ্গে শিক্ষক নেতারা দক্ষ শিক্ষকের অভাব, অংক এবং ইংরেজী শিক্ষকের স্বল্পতা ইত্যাদি বলে দায় এড়াতে চান। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিএ, এমএ পাস করে একজন শিক্ষক নবম-দশম শ্রেণীর অংক, ইংরেজী পড়াতে পারবে না —এ কেমন কথা। না পড়াতে পারলে চাকরি ছেড়ে দিন। প্রয়োজনে মুদি দোকান করুন। সরকার বলবে শিক্ষক আন্দোলনের কারণে এবং শিক্ষকরা বলবেন দক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ফল বিপর্যয় হয়। ১২ লাখ ৫৯ হাজার ১০৫ জন শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করলেও এবার চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে মাত্র ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৯৯ জন, যা গত বছরের পরীক্ষার্থীর চেয়েও ৩ লাখ ৭১ হাজার ৬৩৮ জন কম। অভাবের কারণে চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি ৬ লাখ ৬ হাজার ২০৬ জন শিক্ষার্থী। এমন নজিরবিহীন ঘটনা অতীতে হয়েছে কিনা স্মরণ নেই। সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও অভাবের কারণে যে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারেনি তাদের কাছে দেশের একজন নাগরিক হিসাবে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ক্ষমা চাই স্কুলে না গিয়ে ওএমএস-এর চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা গৌরনদীর নরসিংহ হল পট্টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হতদরিদ্র রফিকের নিকট। ক্ষমা কর পাতাকুড়ানী, কাগজ টোকানি, পথকলি টোকাই বন্ধুরা। বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত কর্তৃক উপস্থাপিত এক ধারণাপত্রে বলা হয়, যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় করা হয় তা দিয়ে ১৫ হাজার প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজনীয় শিক্ষক ২০ বছরের জন্য নিয়োগ করা যায়। স্কুলগুলো হলে তো আম্বিয়া, সখিনারা দু'কলম পড়তে পারত। তাহলে আমরা কেন শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে যথাযথ অর্থ ব্যয় না করে যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম? আমরাতো সভ্য, স্বাধীন জাতি। পারমাণবিক শক্তিধর ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। যুদ্ধটা করব কার সাথে? বিটিভিতেও একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, যেখানে উল্লেখ্য করা হয় ৬,৭৯৬ কোটি টাকা বছরে দুর্নীতি হয় যা দিয়ে ১২ হাজার প্রাইমারি স্কুল করা সম্ভব। প্রশ্ন হলো—গত এক বছরে কয়টি প্রাইমারি স্কুল হয়েছে তা কিন্তু আমরা জানি না। চটকদার বিজ্ঞাপন না দিয়ে বাস্তবতায় আসা জরুরী। সভ্য, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজ দাবি করতে হলে একজন শিশুকেও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যে সমাজে প্রকৃত শিক্ষা যত বেশি প্রসারিত সে সমাজ তত বেশি আলোকিত ও সুসংগঠিত। ফলে একটি সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি আমাদের অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। দেশের সংবিধানে ১৭ নং অনুচ্ছেদে এমনটাই বলা আছে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ যেখানে আজ সম্পূর্ণ ডিজিটালের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেখানে আমাদের শিশুরা অবহেলা, অযত্ন, অপুষ্টিতে ঘাটে-আঘাটে, ফুটপাথে বিড়ালছানার মতো বেড়ে উঠছে। গ্রামের অপুষ্টিতে লিকলিকে হাড্ডিসার দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ময়লা, ছেঁড়া জামা-কাপড় পড়ে স্কুলে যায়। দু'টাকার টিফিন খেতে না পেরে ক্ষুধায় ছটফট করে। কখনও মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এ দৃশ্য দেখার মানসিক শক্তি ক্রমেই আমরা হারিয়ে ফেলছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন, গ্রাম, শহর, ধনী; দরিদ্র; ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাস পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠছে ভিন্ন ভিন্ন বিপরীতমুখী ধারায়। এদের রক্ষা করতে না পারলে কালের স্রোতে হারিয়ে যাবে। রাষ্ট্র যেহেতু চিনি, পাট, সুতা, বস্ত্র শিল্পগুলো রক্ষা করতে পারল না, আদমজী জুট মিল রক্ষা করতে পারল না, তেল, গ্যাস সম্পদ রক্ষা করতে পারল না— অন্তত শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্র রক্ষা করুক। সকল শিক্ষার্থীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা উপকরণসহ সকল ব্যয় রাষ্ট্র বহন করুক— রাষ্ট্রের নিকট এমনটা প্রত্যাশা করি। প্রয়োজনে ১৫ কোটি নাগরিকের মধ্যে ১০ কোটি নাগরিককে স্পেশাল শিক্ষা করের আওতায় আনা হোক। মাসিক এক টাকা করে আদায় করলেওতো বছরে ১২০ কোটি টাকা। তার সাথে সকল ব্যবহারিক উৎপাদিত পণ্যের ওপর থেকেও স্পেশাল শিক্ষা কর আদায় করে ১২০ কোটি টাকার সাথে যোগ করা যায়। রাষ্ট্রের অন্যান্য খাতের ব্যয় কমিয়েও শিক্ষা করের তহবিলে যোগ করা যায়। আমরা চাই সকল শিশু পেটভরে খাবে, স্কুলে যাবে, পরীক্ষায় পাস করবে। তাদের কলরবে সারা দেশ মুখরিত থাকবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে জাতীয় প্রগতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। শতভাগ শিক্ষিত জাতি হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান দখল করবে—এতটুকু চাওয়া, করুণা নয়, অধিকার।

মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন
মগবাজার টিএান্ডটি উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ঢাকা-১২১৭।

দৈনিক জনকণ্ঠ

03 MAY 2008
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩